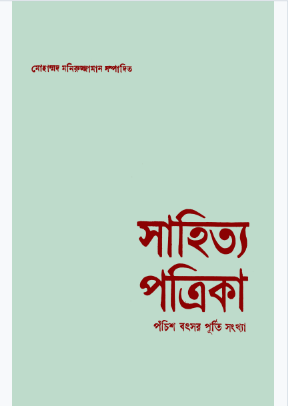

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আত্মার অমরত্ব : স্পিনোজা ও রবীন্দ্রনাথ

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	লতিফা বেগম
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.8
Pages	152-162
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আত্মার অমরত্ব : স্পিনোজা ও রবীন্দ্রনাথ

লতিফা বেগম

অমরত্বলাভকে মানবজীবনের সর্বপ্রধান বা সর্বশ্রেষ্ঠ কাম্য বলা যায়। এ-জগতের বিভিন্ন মনীষী এ-অমরত্বকে বিভিন্নভাবে ধারণা করেছেন। কারো কারো ধারণা—অমরত্বলাভ মানুষের জন্মগত অধিকার। আবার কারো কারো ধারণা—এটি হচ্ছে ধর্মের অবদান। বিশেষ করে হিব্রু ধর্মগুলোতে অমরত্বকে ভগবানের এক বিশেষ অবদান বলে গণ্য করা হয়। এসব ধর্মগুলোতে পরকালের বিচার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা রয়েছে এবং প্রত্যেক মানব বা মানবীকে পরকালের বিচারের সম্মুখীন হতে হবে, এ-বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে; তা সত্ত্বেও এবংবিধ ভয়-ভীতির ঊর্ধ্বে অমরত্বকে একটি অবিসংবাদিত সত্য বলে গণ্য করা হয়েছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীব-জন্তুর পক্ষে অমরত্ব সম্ভব নয় বলে এসব ধার্মিক লোকের ধারণা।

এ-অমরত্বের স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। সাধারণতঃ অমরত্ব বলতে ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণকেই বুঝায়। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও আত্মার স্থিতি বুঝায়। মৃত্যুর সংগে সংগে নরদেহের বিলুপ্তি হলেও মানবাত্মা মৃত্যুর পরবর্তীকালেও অস্তিত্বশীল থাকে বলে মানুষের সাধারণ ধারণা রয়েছে। যদিও সাধারণতঃ বিশ্বাস করা হয় এ-দেহ নশ্বর, আত্মা অমর ও অবিনশ্বর। এ-থেকে স্বাভাবিকভাবেই অনুসিদ্ধান্ত করা হয়, এ-জগতে দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ সম্পূর্ণ আকস্মিক। মানুষের দেহ ও আত্মার মধ্যে খুব নিবিড় সম্বন্ধ থাকলেও, পরস্পর থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে, এবং মৃত্যুর পরে মানবাত্মা স্বতন্ত্র-ভাবে টিকে থাকতে পারে। কবি লঙ্ফেলো [Poet Henry Wordsworth Longfellow] বহু আগেই বলে গেছেন,[১] "মাটির দেহ মাটিতেই লয় হবে, কিন্তু একথা আত্মা সম্পর্কে বলা হয়নি (Dust thou art, to dust returnest, was not spoken of the soul)। এ-উক্তিটি কেবল কবি লঙ্ফেলোর ব্যক্তিগত জীবন-প্রত্যয়ের প্রকাশ নয়। এ-হচ্ছে এ-বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মাবলম্বী লোকের আন্তরিক বিশ্বাস। অবশ্য প্রত্যেক ধর্মের মধ্যেই আত্মার এ-স্বাতন্ত্র্য প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে অভিজ্ঞতার দিক থেকে এ-প্রত্যয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ পেশ করা সম্ভবপর নয়। এ-প্রত্যয়কে মানবজীবনের একটা বিশেষ সান্ত্বনা বলে গণ্য করতে হয়। জীবনকালে যে-সব মানুষের দ্বারা অসাধ্য সাধন হয়, যাদের প্রতিভার দৌলতে এ-বিশ্ব নানাবিধ অবদানে সমৃদ্ধ হয়, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা চিরকালের জন্য অবলুপ্ত হবে, এরূপ কোন আশঙ্কা মানুষ সহ্য করতে পারে না। তাই যে-কোন অবস্থায় দেহ এবং আত্মাকে দুটো পৃথক বিষয় বলে ধারণা করে, দেহের ধ্বংসের পরেও আত্মার স্থিতি সম্বন্ধে প্রত্যয়শীল হয়েও মানুষ সান্ত্বনা লাভ করে। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাই আত্মার অমরত্বের ধারণা এক হিসাবে অপরিহার্য। তবে তত্ত্বীয় দিক থেকে এ-ধারণার পোষকতায় কোন যুক্তির অবতারণা করা যায় কিনা, ভেবে দেখবার বিষয়। এ-ক্ষেত্রে এ-ধারণার ভিত্তিতে যে-সব পদ (term) ও তাদের সম্বন্ধ রয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করা প্রয়োজন। এতে স্বতঃসিদ্ধ হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছে মানুষের দেহ ও আত্মার সাময়িকভাবে মিলন ঘটলেও, তারা আদিতে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, এবং একটির অভাবে অপরটির স্থিতি সম্ভবপর। বিশ্লেষণ

করা যায়, তার অভিনব পন্থা আবিষ্কার করেছেন। অতি আধুনিককালে প্রাচ্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও এরূপ জীবনকালে অমরত্বলাভের সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ ও স্পিনোজার মধ্যে মতভেদ রয়েছে, তবুও তাঁরা দুজনেই একমত যে, আত্মার অমরত্ব এ-জগতেই লাভ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোন কোন প্রত্যয়ের মধ্যে পুনর্জন্ম স্বীকার করে নিলেও, এ জন্মে যে মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে সে সম্বন্ধে ছিলেন নিঃসন্দেহ। এজন্য তিনিও দার্শনিক স্পিনোজার মত এ-জন্মেই অমরত্ব-লাভের সাধনাতে ছিলেন মগ্ন।

দার্শনিক স্পিনোজা তাঁর সারবস্তু (Substance) নামক প্রকল্পের আলোকে এ বিশ্বের যাবতীয় বিষয়ের ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতবাদ অনুসারে সে আদি-সারবস্তুর রয়েছে অগণিত, অসীম গুণাবলী। সেগুলো এ বিশ্বে খণ্ডিত আকারে প্রকাশিত হয়। সাধারণতঃ ধর্মজগতে প্রচারিত দেহ ও আত্মার বিচ্ছিন্নতা মোটেই যুক্তিসহ নয়; দেহ ও আত্মা দুটো ভিন্নমুখী পদার্থ নয়। তারা সারবস্তু নামক আদি পদার্থের দুটো গুণের খণ্ডিতরূপ বটে। মানুষ হিসাবে চিন্তা এবং বিস্তৃতি (Thought and extention) নামক দুটো গুণ আমাদের জীবনে বিশেষভাবে রূপায়িত এবং এ দুটোকেই জানতে পারা যায়, অন্যগুণ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা সম্ভব নয়। সে অসীম চিন্তার খণ্ডিতরূপ হচ্ছে আমাদের চেতনা, এবং সেই অসীম বিস্তৃতির এক খণ্ডিতরূপ হচ্ছে আমাদের দেহ। এরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও তাদের মধ্যে সমান্তরাল সম্বন্ধ বর্তমান। দেহ আঘাতপ্রাপ্ত হলে আমাদের চেতনায় তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, এবং চেতনাতে পরিবর্তন দেখা দিলে দেহে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে।

মানুষ হিসাবে জ্ঞানলাভ আমাদের পক্ষে অপরিহার্য, জ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সম্যকভাবে অবগত হতে পারে। যে জ্ঞানের অনুশীলনের ফলে মানুষ যখন যে আদি সত্তা থেকে কিভাবে এ বিশ্বচরাচরে সবকিছুর উৎপত্তি হচ্ছে, এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারে, তখন এ বিশ্বের সব কিছুই তার কাছে যে আদি সত্তারই একটা বিশিষ্ট গুণের খণ্ডিত প্রকাশ বলে প্রতিভাত হয়, এবং অতি ক্ষুদ্র তৃণ থেকে প্রচণ্ডতম গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত সবকিছুই সেই আদি সত্তার থেকে উৎসারিত হচ্ছে বলে প্রতিভাত হয়। এবংবিধ ধারণা ব্যতীত মানবজীবনে ক্রিয়াশীল আবেগ ও ইচ্ছাশক্তিকে স্পিনোজা মোটেই স্বীকার করেননি। তাঁর ধারণা এগুলো হচ্ছে অস্পষ্ট চিন্তার ফল। কেবলমাত্র চিন্তার মাধ্যমেই আমরা সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে পারি। এজন্য সকল সত্যানু-সন্ধানীর পক্ষে চিন্তার দ্বারা পরিচালিত হয়ে সত্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা উচিত। সে সত্য সারবস্তু ব্যতীত আর কিছুই নয়। যেভাবে সূর্য থেকে তার কিরণগুলো স্বাভা-বিকভাবেই বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি সারবস্তু থেকে স্বাভাবিকধারায় অসংখ্য গুণাবলী ও তাদের খণ্ডিত অংশ প্রকাশ পায়। এটি হচ্ছে এক অনন্ত ধারার প্রকাশ, এবং এ অভি-ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনকে প্রতিভাস বলা যায়। তার ফলে জ্ঞানীর মানসে সেই আদি-সত্তার প্রতি প্রেমের উৎপত্তি হয় এবং এ বিশ্ব বিধানের সংগে একীভূত হয়ে মহা-আনন্দলাভ করে। তখন তার পক্ষে জীবন মৃত্যুরই উত্থান ও পতন অথবা বিভিন্ন বস্তুর এক রূপ থেকে অন্যরূপে পরিবর্তনের কোন বিশেষ মূল্য থাকেনা। এ গুলো মায়ামরী-চিকা বলেই উপলব্ধ হয়। এভাবেই মানুষ অমরত্বলাভ করে। কারণ জ্ঞানের মাধ্যমে জ্ঞানী বিশ্ববিধানের সংগে একীভূত হয়ে যাওয়ায়, তারপক্ষে আর মৃত্যুর কোন আশঙ্কা থাকে না। এস. আলেকজাণ্ডার তাঁর 'স্পিনোজা এ্যাণ্ড টাইম' (১৯২৭) গ্রন্থে সত্যিই বলেছেন: স্পিনোজার চিন্তার মধ্যে সময়ের কোন স্থান নেই। কারণ এ বিশ্বের সব কিছুরই উৎপত্তিস্থল সেই আদি এবং আসল সারবস্তু, এবং বিভিন্ন বিষয়গুলো সেই আদি বস্তুর গুণাবলীতে প্রত্যাবর্তন করে। এ ধারা চিরন্তন এতে আদি এবং অন্ত

বলে কিছুই নেই। আমরা অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে নানাবিধ বিষয়কে প্রত্যক্ষ করি বলেই তাদের মধ্যে আদি এবং অন্ত বলে দুটো পর্যায় অবলোকন করি। তার ফলেই সময় নামক একটা বিষয়ে আমাদের বিভ্রান্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, এ বিশ্বের আদি-অন্ত বলে কিছুই নেই। তার সর্বত্রই সেই একমাত্র সারসত্তা বর্তমান। এ বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা সেই সারবস্তুর মধ্যেই ঘটছে। যেহেতু সারসত্তার মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই; এ জন্য তার অন্তর্গত এ বিপুল বিশ্বের মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। উদাহরণস্থলে বলা যায় সামান্য ও ক্ষুদ্র একটা বীজ থেকে একটা চারাগাছের সৃষ্টি হয় এবং সে চারাগাছ থেকে বিরাট বিপুল মহীরূহের উৎপত্তি হয়। এতে যদি ভাবা হয় যে বীজ থেকেই এ বিরাট বৃক্ষের উৎপত্তি হয়েছে, তাহলে মস্তবড় ভুল হবে। কারণ সেই বীজের মধ্যে রয়েছে বিরাট বিশ্বের অবদান; এক অনন্ত ধারার কার্যকারিতার ফলে বীজের উৎপত্তি, এবং পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হওয়ার পরে যখন বৃক্ষটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন সে অনেককিছুতেই বিলীন হয়ে যাবে এবং সে সবগুলো উপাদান এ সারবস্তুর মধ্যেই রক্ষিত হবে। যদি আমরা গভীর ভাবে চিন্তা করি, তাহলে স্পষ্টই দেখতে পাবো এ বীজের মতই এ বিশ্বের সব কিছুরই আদি উৎপত্তিস্থল সেই সারবস্তু এবং প্রত্যেক বিষয়ই তার পরিণতিতে সেই সারবস্তুর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। এজন্য যদিও আপাততঃ কোন এক বিষয়কে কারণ এবং অপরটিকে কার্য বলে অভিহিত করি, প্রকৃতপক্ষে এগুলো হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রয়োজনের ফল। বিশ্ব-দৃষ্টির থেকে অবলোকন করলে, কার্য বা কারণ বলে কোন কিছুকেই আমরা একেবারে নিরঙ্কুশ (Absolute) বলে গ্রহণ করতে পারিনা। এটি হচ্ছে আমাদের অবভাসের ফল।

এজন্যই স্পিনোজা মানব জাতিকে উপদেশস্থলে বলেছিলেন, মানুষের পক্ষে অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিশ্বকে অবলোকন করা উচিত। তাঁর এ মতবাদ থেকেই তাঁর নৈতিক মতবাদের উৎপত্তি। তাঁর নৈতিক মতবাদ অনুসারে মানুষের পক্ষে সেই স্বয়ম্ভূ স্বাবলম্বী সারসত্তাকে জীবনে অনুভব করা এবং কিভাবে এই সারসত্তার থেকে অসংখ্য গুণাবলী অনিবার্যভাবেই বিচ্ছুরিত হচ্ছে, সে ধারাকে সত্য হিসাবে গ্রহণ করাই হচ্ছে মানবজীবনের সর্বোচ্চ নৈতিক আদর্শ। স্পিনোজার মতবাদ অনুসারে এরূপ অবধাবনের ফলে মানুষের জীবনে ভগবানের প্রতি বৌদ্ধিক প্রেমের (Intellectualis Amor Dei), উৎপত্তি হয়। যেহেতু তিনি ভগবান ও সারবস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি, এ জন্য তিনি ভগবানের মধ্যে কোন ব্যক্তিত্বের প্রকাশ রয়েছে বলেও স্বীকার করেননি। ভগবানকে সারসত্তা হিসাবে এ বিশ্বের সর্বত্রই বিরাজমান বলে তিনি ধারণা করেছেন।

এতে স্পষ্টই বুঝা যায় অন্যান্য মনীষীদের মতো তিনি অমরত্বকে মৃত্যু-উত্তর কোন অবস্থা বলে স্বীকার করেননি। তিনি মানবাত্মার মৃত্যু-উত্তর কোন পৃথক সত্তা বলে ধারণা করেন না। জীবনকালেও এরূপ কোন আত্মার অস্তিত্বের সন্ধান তিনি পাননি। তাঁর কাছে মানুষ মাত্রই দুটো গুণের দ্বারা গঠিত, একটি হচ্ছে বিস্তৃতি, অপরটি হচ্ছে চিন্তা এবং এ দুটো গুণের আধার হচ্ছে সারবস্তু। কাজেই এ দুটো গুণের প্রকৃত পরিচয়লাভ করলে মানুষ সেই সারবস্তুর সংগে একীভূত হতে পারে। স্পিনোজার মতবাদ অনুসারে সত্যের এ উপলব্ধি থেকে মানুষ সর্ববিধ পরিবর্তনের ও পরিবর্ধনের উর্ধ্বে আরোহণ করে এবং এজন্যই সে অমরত্বলাভে সক্ষম হয়। মানবমাত্রের পক্ষেই এ উপলব্ধি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানুষ হিসাবে আমাদের সকলের পক্ষেই সেই আদর্শের বাস্তবায়ন করা উচিত। এ জন্য স্পিনোজার নিকট নীতিশাস্ত্র একটা পৃথক বিষয় হিসাবে গণ্য হয়নি। তাঁর কাছে নীতিশাস্ত্র ছিল সত্যজ্ঞানেরই একটি শাখা। সত্য লাভের গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়ে মানুষ যে জ্ঞানলাভ করে, তারই আলোকে সে তার

নৈতিক জীবন-যাপন করে। স্পিনোজা প্রদর্শিত পন্থায় মানুষ অমরত্ব লাভ করলে তারপক্ষে উত্থান ও পতনের আর কোন প্রশ্নই থাকে না ; সে বিশ্ববিধানের সংগে একাকার হয়ে যায়।

আধুনিককালে সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশেষজ্ঞরূপে ; সুন্দরের স্রষ্টার এক মহান প্রতিনিধিরূপে রবীন্দ্রনাথ এ বিশ্বের মনীষার ক্ষেত্রে মহত্তম শীর্ষস্থানের অধিকারী। এ বিশ্বের সর্বত্র এক অপরূপ সৌন্দর্য্য বিরাজমান, এ সত্যটির আবিষ্কর্তা হিসাবে তিনি অদ্বিতীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বিশ্বজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন। তাঁর সৃষ্টিকর্ম সম্বন্ধে এবং বিশ্বদর্শন সম্বন্ধে নানাবিধ ভাষ্য রচনা করা হয়েছে। এসব ভাষ্যের মধ্যে বিভিন্নতা রয়েছে সত্য, তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে তিনি আজীবন একজন আশাবাদী ছিলেন। তিনি এ বিশ্বের সর্বত্রই শৃঙখলা, সুসামঞ্জস্য এবং আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি মানবসাধারণকে এ বিশ্বের আনন্দ যজ্ঞে যোগদান করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ নিমন্ত্রণের অর্থ হচ্ছে এ বিশ্বে একটা শান্তি ও সংহতিপূর্ণ জীবন-যাপন করাই মানবজীবনের কর্তব্য। মানুষের পক্ষে এ প্রকৃতির নানাবিধ দৃশ্য, গন্ধ ও গানের সংগে একীভূত হওয়াই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রকৃতি তাঁর কাছে এক প্রেমময়ী দেবীরূপে শ্রদ্ধা ও অর্ঘ্য লাভ করেছিল।

গোঁড়া সম্প্রদায়ের মতো তিনি মানুষের পাপ-পূণ্যের বিচারের জন্য কোন পরকালের অপেক্ষা করেননি। তাঁর মতবাদ অনুসারে প্রকৃতির বিধানের বিপরীত আচরণ করার ফলে, মানুষের জীবনে যে পাপ দেখা দেয়, প্রকৃতি নিজ হস্তে এ জীবনে তার সংশোধন করেনি। তিনি তাঁর এক কবিতায় বলেছেন :

তোমার বিচার ঘর
পুষ্পবনে,
পূণ্যসমীরণে,
তৃণপুঞ্জে পতঙ্গগুঞ্জনে,
বসন্তের বিহঙ্গকূজনে
তরঙ্গচুম্বিত তীরে মর্মরিত পল্লববীজনে।[২]

রবীন্দ্রনাথের এ উক্তি থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয়, তিনি কোন কোন জীবন্তধর্মের ধারণা অনুযায়ী মৃত্যুর পরে পাপপূণ্যের বিচারে কোন প্রত্যাশা বা আশঙ্কা করেননি। তিনি এ জীবনেই পাপ-স্খলনের জন্য প্রকৃতির সুউত্তম ব্যবস্থার ধারণা করেছেন।

একথা অবশ্য সত্যি যে, তাঁর কোন কোন কাব্যে জন্মান্তরবাদের ধারণার সন্ধান পাওয়া যায় এবং কর্মের প্রবাহ থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত এ শৃঙ্খল থেকে যে মানুষের মুক্তি নেই, সে তত্ত্বও কোথাও তিনি আভাসে-ইঙ্গিতে বলেছেন :

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

পুরানো আবাস ছেড়ে যাই যবে
মনে ভেবে মরি কী জানি কী হবে,
নূতনের মাঝে তুমি পুরাতন
সে কথা যে ভুলে যাই।
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।[৩]

এ উক্তিকে তাঁর চিন্তাধারার একটি বিশেষ পর্যায়ের ফল বলা যায় কিন্তু চিন্তার বিকাশের পরিপূর্ণ ফল বলে একে গ্রহণ করা যায় না। তাঁর নানাবিধ কাব্যে এবং বক্তব্যে যে-সুরটি প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে, তা হচ্ছে এ-বিশ্ব এক আনন্দময় সত্তার প্রকাশ এবং তাতে জন্ম, মৃত্যু, এক একটা দিক মাত্র, তাতে উত্থান-পতন সব কিছুই চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে। কাজেই মৃত্যুর সংগে সংগে মানবাত্মার লয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। এ-দেহেরও কোন বিনাশ নেই। কাজেই পূর্বোক্ত পর্যায়কে (জন্মান্তর) তার মানস-বিকাশের একটা অধ্যায় মাত্র বলা যায়। তাঁর সর্বশেষ বক্তব্য হচ্ছে এ-বিশ্বের সংগে একীভূত হয়ে রসঘন আনন্দের আস্বাদন এবং তার ফলে অমরত্বলাভ সম্ভব। তিনি বিশ্বমানবের প্রতিনিধি হয়ে অমরত্ব লাভের বাসনার অনুসিদ্ধান্ত হিসেবেই বলেছিলেন :

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যেন স্থান পাই।[৪]

এ-বক্তব্যের মধ্যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত বাসনা প্রকাশ করেননি। এতে তিনি বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি হয়েই একটা বিশেষ শর্তে অমরত্ব লাভ করতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে সে অমরত্বলাভ করা যায়? রবীন্দ্রনাথ, স্পিনোজার মত যুক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন না। এ জন্য তিনি বুদ্ধির মাধ্যমে এ-স্তরে উপনীত হতে চাননি। তিনি প্রকৃতিতে বিরাজমান সৌন্দর্যকে আত্মস্থ করার মাধ্যমকেই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থাবলে গ্রহণ করেছেন। তিনি মানব সাধারণের কাছে এ সত্যটি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন : মানুষের পক্ষে এ মাটির পৃথিবীকেই আধ্যাত্মিক সত্তা বলে গ্রহণ করা কর্তব্য। এ মাটির পৃথিবীর থেকে ভিন্ন অপর কোন অধ্যাত্মিক সত্তার কোন মূল্য তাঁর জীবনে ছিল না। এজন্য তিনি বলেছেন :

এসো এসো চলে এসো বয়সের জীর্ণ পথ শেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এসো পার ;
ফেলে এসো ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার

চিরদিনকার
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।[৫]

তাঁর এবংবিধ ধারণা তাঁর নানাবিধ পদ্য ও গদ্য রচনার মধ্যে বিশেষভাবে প্রকাশিত। এজন্য তাঁকে স্পিনোজার মত জীবনকালে অমরত্ব লাভের জন্য প্রয়াসী বলা যায়। উভয়ের পক্ষে মৃত্যু একটা পরিবর্তন মাত্র। মৃত্যুর অর্থ সমূলে বিনাশ নয়, এ-ধারণার মূলে স্পিনোজার মতো রয়েছে তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) বিশ্বদৃষ্টি। যদিও এ-বিশ্ব আমাদের কাছে ধূলিকণার এক সমুদ্র বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু অর্ন্তদৃষ্টির ফলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তঃস্থলে

জীবনের সন্ধান লাভ করেছিলেন, এবং সংগে সংগে সেই জীবন্তসত্তার অপরূপ সৌন্দর্য অবলোকন করে আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন। তিনি এ-জীবনদর্শনকে তাঁর এক কবিতায় অপূর্ব মাধুর্যময় করে প্রকাশ করেছেন :

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি,
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহামন্ত্রখানি
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা-কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।
তাই এই মন্ত্রবাণী মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে——
সব ক্ষতি মিথ্যা করি অনন্তের আনন্দ বিরাজে।
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর——
ব'লে যাব তোমার ধূলির
তিলক পরেছি ভালে,
দেখেছি নিত্যের জ্যোতি দুর্যোগের মায়ার আড়ালে।
সত্যের আনন্দরূপ এ-ধূলিতে নিয়েছে মুরতি
এই জেনে এ ধুলায় রাখিনু প্রণতি।। [৬]

এতে একথা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী সাধারণ মানুষের কাছে একটি শত্রুভাবাপন্ন সত্তা বলে প্রতিভাত। যে পৃথিবীতে অসংখ্য শত্রু মানবজীবনকে ধ্বংস করার জন্য ওৎ পেতে রয়েছে এবং যে পৃথিবীর কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর রূপের ভয়ে মানুষ সর্বদাই আতঙ্কিত, রবীন্দ্রনাথের কাছে তা হচ্ছে মানবজীবনের অপর এক মূর্তি। মানবজীবনে যেভাবে নানাবিধ বৃত্তি ও প্রবৃত্তি রয়েছে এবং যেগুলো থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে এক সংহতি বিরাজমান, সেরূপ বিশ্বপ্রকৃতিতেও নানাবিধ পরস্পরবিরোধী গুণাবলী থাকলেও এক অপূর্ব সামঞ্জস্য ও সংহতি বর্তমান। এ সংহতিপূর্ণ পৃথিবীতে ক্ষয়-ক্ষতি বলে কিছুই নেই, রয়েছে মহাআবর্তন। রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্ব সম্পর্কিত তাঁর এই দার্শনিক মতবাদকে 'আবর্তন' নামক এক কবিতায় চমৎকার রূপ দিয়েছেন :

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।
সুর আপনারে ধরা দিতে চাহে ছন্দে,
ছন্দ ফিরিয়া ছুটে যেতে চায় সুরে।
ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ,
সীমা চায় হতে অসীমের মাঝে হারা।
প্রলয়ে সৃজনে না জানি একার যুক্তি,
ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসা——
বন্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা। [৭]

এ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, এ বিশ্বের সর্বত্র আবর্তনের এক চিরন্তন-রূপ পেয়েছিলেন বলে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধ্বংস বা লয়ের কোন মূল্য ছিলনা। লয় বলে কিছু নেই, রূপ

থেকে রূপান্তর হচ্ছে এবং একটা আবর্তনের ধারা চলছে এ বিশ্বভূমণ্ডলে। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অনু-পরমাণু থেকে সুবিশাল ও সুউচ্চ পর্বতরাজী এ আবর্তন ধারার অন্তর্গত। একই রূপ থেকে এ বিশ্বের সকল বস্তুই অন্যরূপ পরিগ্রহ করে। এতে রূপান্তর হচ্ছে বটে, তবে কোন ক্ষয় বা লয় এতে নেই। এজন্যই রবীন্দ্রনাথ সাধারণ ভাষায় প্রকাশিত জড় ও চেতনাময় ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিভাগ করেননি। তাঁর কাছে অস্তিত্বের অর্থ হচ্ছে এমন এক সামগ্রিক সত্তা, যার মধ্যে রূপান্তর ঘটছে, তবে সে সত্তাকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করলে তার মধ্যে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। কাজেই দেহের যেমন লয় নেই, তেমনি আত্মারও লয় নেই। শুধুমাত্র রূপান্তরই একমাত্র সত্য। তাই যদি হয়, তাহলে মৃত্যুর পরে দেহ এবং আত্মার রূপান্তর হতে পারে, লয় হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই।

তাঁর এ দার্শনিক মতবাদ নিম্নলিখিত কবিতায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে :

একদা এ ভারতের কোন বন তলে
কে তুমি মহান প্রাণ, কী আনন্দ বলে
উচ্চারি উঠিলে উচ্চে, 'শোন বিশ্বজন,
শোন অমৃতের পুত্র যত দেবগণ
দিব্যধামবাসী, আমি জেনেছি তাঁহারে
মহান্ত পুরুষ যিনি আধারের পারে
জ্যোতির্ময়। তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি,
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্যপথ নাহি ![৮]

প্রশ্ন হচ্ছে, মানবজীবনে অমরত্বলাভ করতে হলে কিভাবে জ্ঞানের অথবা কর্মের অনুশীলন প্রয়োজন সে সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে হবে। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হচ্ছে, বিশ্বপ্রেমের মাধ্যমেই মানুষ সে অমরত্বলাভে সমর্থ হয়। যেমন তিনি বলেছেন : "আনন্দ গান গারে হৃদয়, আনন্দ গান গারে"—তিনি তাঁর জীবন-দেবতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, বিশ্ব সাথে যোগ যেথায় বিহারো, সেইখানেতে তোমার সাথে যোগ আমারও।

এসব উক্তি থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় রবীন্দ্রনাথ এ পৃথিবী বহির্ভূত-অথবা আমাদের ইন্দ্রিয়-বহির্ভূত কোন ভগবানের সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর কাছে আদি-সত্তা ছিল জীবন এবং প্রকৃতির সমবায়ে গঠিত এক বিরাট 'সত্তা'। তাঁর পরবর্তী চিন্তা-ধারায় তিনি এই বিরাট সত্তার মধ্যে তিনটি গুণ আবিষ্কার করেছিলেন। সে সত্তার একদিকে যেমন আপনাকে প্রকাশ করার প্রবৃত্তি রয়েছে, তেমনি তাঁর মধ্যে তুরীয়তার (Transcendence) প্রবৃত্তিও রয়েছে ; এবং এ-প্রকাশ ও তুরীয়তার মধ্যে তিনি তাঁর প্রকৃতির স্বরূপও খুঁজে পান। যে সত্তা তুরীয়রূপে আমাদের পেরিয়ে যায়, যা আমাদেরই আত্মার এক বৃহৎ রূপ এবং তার সন্ধান আমরা আমাদের সজ্ঞান-মানসের বিস্তৃতির ফলে অনুভব করতে পারি। আমাদের ক্ষুদ্রতর আত্মার প্রকাশ হচ্ছে অবিবার্যতার ক্ষেত্রে। অপরদিকে আমাদের বৃহত্তর আত্মার স্থিতি হচ্ছে উদ্বৃত্ত (Surplus) ক্ষেত্রের মধ্যে। আমাদের বৃহত্তর আত্মার মধ্যে সবগুলো মূল্যমান সংরক্ষিত হয়। "এ জন্যই যে অবস্থার সংগে আমাদের আত্মার এখনও পরিচয় হয়নি, সেই অবস্থাই আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ অবস্থার চেয়ে অধিকতর বাস্তব বলে অনুভূত[৯]।" ['The state not yet experienced becomes more real than that under his direct experience.']

উপরে উদ্ধৃত রবীন্দ্রনাথ ও স্পিনোজার নানাবিধ বক্তব্য থেকে আমরা স্পষ্টই বুঝতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের ধারণার সঙ্গে স্পিনোজার মতবাদের রয়েছে আত্মিক যোগ। উভয়েই অমরত্বকে এমন একটা অবস্থা বলে ধারণা করেছেন যা মানুষ এ-জীবনেই আয়ত্ত করতে পারে, অমরত্বলাভের জন্য পরকালের অপেক্ষা করা তাঁদের মতে বাঞ্ছনীয় নয়, তার জন্য মানুষকে পরলোকের অপেক্ষা করতে হয় না। তবে স্পিনোজা যেরূপে সে আদিসত্তাকে এক জ্যামিতিক বিষয়বস্তুর মত স্থিতিশীল বলে ধারণা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেরূপ ধারণা করেননি। তাঁর কাছে বিশ্বসত্তা মানুষেরই এক দোসর এবং নানাবিধ গুণের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ উক্ত দার্শনিক প্রত্যয়ে এ বিশ্বকে নানা রূপ থেকে রূপান্তরে পরিণত করছেন।

তবে উভয়ের মধ্যে আদি-সত্তার ধারণায় পার্থক্য থাকলেও, অমরত্ব সংক্রান্ত ধারণায় ঐক্য রয়েছে। তাঁরা এ বিশ্বের সারসত্তা সম্বন্ধে যা ধারণা করেছিলেন, সে ধারণার দ্বারাই তাদের মতবাদ প্রভাবান্বিত হয়েছিল। স্পিনোজা সার বস্তুকে একটা সর্বাত্মক দ্রব্য হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। সেই সারবস্তুর মধ্যে নিহিত চিন্তা এবং বিস্তৃতি নামক দুটো গুণ আমাদের জীবনে রয়েছে বলে সেগুলো সম্বন্ধে আমরা সম্যকভাবে অবহিত। কারণ তাদের খণ্ডিত প্রকাশ-রূপেই এ বিশ্বের সবকিছু অবস্থিত। এ চিন্তাধারার পরিণতিতে স্পিনোজা ধারণা করেছিলেন আমাদের এই দেহ বিস্তৃতির এক খণ্ডিত রূপ বলে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে সর্বাবস্থায় সে বিস্তৃতির মধ্যেই অবস্থান করবে। তেমনি আমাদের মানসজগতের এক খণ্ডিত চিন্তা অন্য চিন্তায় পরিণত হতে পারে, তবে সর্বাবস্থায় সে খণ্ডিত ও পরিবর্তিত চিন্তা সেই অসীম চিন্তার মধ্যেই বিরাজ করবে। এই পরিবর্তনের ধারায় কোন ক্ষতি বা বৃদ্ধি হয় না। আপাতঃদৃষ্টিতে স্পিনোজার সারবস্তুকে নৈর্ব্যক্তিক (Impersonal) ও প্রাণহীন ধারণা বলে মনে হয়। তবে এ সত্তার বাইরে কোন কিছুই নেই। মানবজীবনের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না সব কিছুকেই চিন্তা এবং বিস্তৃতির খণ্ডিতরূপ বলেই গণ্য করতে হবে। এ জন্য স্পিনোজা মৃত্যুতে কোন ক্ষতির আশঙ্কা করেননি। মৃত্যুকে তিনি বিভিন্ন খণ্ডিতরূপের পরিবর্তন বলেই গ্রহণ করেছেন। এজন্য তিনি বলেন, অনন্তদৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে এ পৃথিবীর প্রত্যেকটি বিষয়ের অস্তিত্বের সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায়। তা থেকেই ভগবানের প্রতি বুদ্ধিজাত প্রেম উপজাত হয় বলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেছেন। একথা (যদিও) সত্য যে, প্রকৃতিতে নানাবিধ হিংসা ও অত্যাচারের দৃশ্য দেখা যায়, যাকে কবি টেনিসন রক্ত, চঞ্চু ও রক্তকর পূট (red in tooth and claw) বলেছেন, তাও অসত্য নয়। তবে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করলে সেই পরস্পর বিরোধী নানাবিধ দৃশ্যের মধ্যেও একটা সংহতি লক্ষ্য করা যায়। এ জন্যই এ পৃথিবীর ভয়াল ও ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যেও স্পিনোজা এক সংহতি আবিষ্কার করেছিলেন। স্পিনোজা বোধহয় এ-মন্ত্রেই দীক্ষিত হয়েছিলেন : ১০ "সত্য নিষ্ঠুর হলেও তাকে ভালবাসা যায়, এবং যারা তাকে ভালবাসে, সত্য তাকে মুক্তিদান করে;" [The Truth is cruel but it can be loved, and it makes free those who have loved it.]।

স্পিনোজার মত রবীন্দ্রনাথও তাঁর দার্শনিক মতবাদ থেকে তাঁর অমরত্ব সংক্রান্ত মতবাদ গঠন করেছেন। স্পিনোজার মত তিনি আদি-সত্তাকে একটা সামগ্রিক বিষয় বলে গ্রহণ করেছেন এবং তার মধ্যে পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন, তবে তার মধ্যে কোন ক্ষয় নেই বলে তিনি ধারণা করেছেন। এ জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছেও মৃত্যু একটা পরিবর্তন মাত্র। এতে কোন ক্ষয়-ক্ষতি নেই। যে ব্যক্তি আদি-সত্তার সংগে নিজেকে একীভূত করতে পারে, তার কোন মৃত্যু নেই। সে আদি-সত্তা স্পিনোজার কাছে সারবস্তু (Substance), উপনিষদের ঋষিদের কাছে পরম ব্রহ্ম এবং রবীন্দ্রনাথের কাছে

পরম জীবন। মানবসত্তা সেই মহাজীবনের সংগে একীভূত হলে, তার কোন ক্ষয়-ক্ষতি বা বিলুপ্তি নেই। সেই আদি-সত্তার এবং সেই মহান জীবনের অংশ বিশেষ সত্য হয়ে দেখা দিলে মানুষের পক্ষে অমরত্বলাভ করে আনন্দঘন জীবনযাপন করা সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও স্পিনোজার অমরত্ব-সংক্রান্ত মতবাদ আলোচনায় আমরা দেখেছি যে উভয়ের ধারণা ছিল মানব-ব্যক্তিত্বকে সারবস্তু, অথবা বিশ্ববিধানের সংগে একীভূত করাতেই অমরত্বলাভ হয়। এজন্য উভয়েই ব্যক্তিসত্তাকে সেই আদিসত্তার মধ্যে বিলীন করার জন্য প্রেরণা দান করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে, সেই ব্যক্তিসত্তাকে আদিসত্তার মধ্যে বিলীন করা যায় ? স্পিনোজার নির্দেশ মত চিরন্তন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ববিধানের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা' সম্ভবপর হতে পারে। তবে সে দৃষ্টিপাতের প্রস্তুতি স্বরূপ আমাদের মানসকে পুনর্বিন্যাস করতে হবে। সেজন্য আমাদের প্রত্যেককেই যুক্তিপ্রধান মানসের অধিকারী হতে হবে। এখানেই যত সমস্যার উৎপত্তি। সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ-ভাবে যুক্তিপ্রধান হওয়া সম্ভবপর নয়। অপরদিকে সাধারণ মানুষের কাছে দেহহীন আত্মার অবস্থানও অসম্ভব। সাধারণ মানুষেরা একথা ভাবতেই পারে না যে, যদিও-বা এ জন্মে মানুষের পক্ষে সে সারসত্তার সংগে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হয়, মৃত্যুর পরেও দেহহীন অবস্থায় সেই ঐক্যের স্থিতি সম্ভবপর নয়। স্পিনোজার বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু মানবদেহ সেই বিস্তৃতির মধ্যে লয় পাবে এবং মানবমানস পরিবর্তিত অবস্থায় সেই অসীম চিন্তার মধ্যেই আশ্রয় পাবে, তাহলে এতেই তো তার এক অমরত্ব লাভ হয়। চিরন্তন ধারার দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুকে তাই এক পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যাঁরা এ জগতে অমরত্বলাভ করেছেন, মৃত্যুর সংগে সংগে তাঁদের সেই ঐক্য নষ্ট হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। যাঁরা গভীর অনুধ্যানের (Meditation) মাধ্যমে সে অমরত্বলাভ করেছেন, তাঁদের পক্ষে সে অমরত্বের বিনাশেরও কোন আশঙ্কা নেই।

এ ক্ষেত্রে স্পিনোজা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান পরিহার করেছেন। মানবজীবনে বিস্তৃতি ও চিন্তার ওতপ্রোতসম্বন্ধ দেখা দেয় ব্যক্তিসত্তার মধ্যে। দেহের মধ্যে সামান্য ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দিলে চিন্তার রাজ্যে সেরূপ আনুসঙ্গিক ক্ষয়-ক্ষতি দেখা দেয়। মৃত্যু সেই ব্যক্তিসত্তার ধ্বংসরূপে দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য বিষয় হচ্ছে মানুষ যখন এই জীবনেই তার অমরত্বলাভ করে, তখন তার সে ব্যক্তিসত্তার পক্ষে যে-আনন্দ-ময়-যাপন করার সূচনা দেখা দেয়, মৃত্যুর পরেও সেই ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব অটুট থাকে কিনা ? স্পিনোজা এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি। তাঁর সমাধান থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় তিনি জীবিত মানুষের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধেই আলোচনা করেছেন, মৃত মানুষের ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি। মৃত্যুর পরে যে ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা মানবজীবনে দেখা দেয়, সে সময় সেই ব্যক্তি-সত্তার পক্ষে পূর্বজীবনের সাধনার ফলে অর্জিত অমরত্ব সম্বন্ধে কোন ধারণা অক্ষুন্ন থাকে কিনা; সে সম্বন্ধে কোন আলোচনা করেননি।

রবীন্দ্রনাথ, অপরপক্ষে, মানবব্যক্তিত্ব-সংক্রান্ত ধারণায় স্পিনোজার চেয়ে অনেক-বেশী ভাবপ্রবণ ছিলেন। তিনি ব্যক্তিসত্তাকে শুধুমাত্র বিস্তৃতি ও চিন্তার মধ্যে আবদ্ধ করেননি। চিন্তা এবং বিস্তৃতি ব্যতীত তিনি ব্যক্তিসত্তার মধ্যে বিভিন্ন আবেগ, ইচ্ছাশক্তি এবং মানবচরিত্রের আরও নানাবিধ দিককে তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি যখন এ-জন্মেই অমরত্ব লাভ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তখন সেই অমরত্ব বলতে এ-বিশ্ববিধানে ব্যক্তিজীবনের সকলগুলো বৃত্তি এবং প্রবৃত্তির সংরক্ষণ রূপেই তাকে গ্রহণ করেছেন।

স্পিনোজার মতবাদ সম্বন্ধে যে বিষয়টি উত্থাপিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের মতবাদ সম্বন্ধে সেই প্রশ্নটাই পুনরায় উত্থাপিত হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন করা যেতে পারে দেহহীন আত্মার অস্তিত্ব কি সম্ভব? বিদেহী আত্মার পক্ষে তার পূর্ব-জীবনের সত্তার সংরক্ষণ কি সম্ভবপর? অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে স্পষ্টই দেখা যায় প্রত্যেকটি দেহের সংগে একটা মনের যোগ রয়েছে; যখন দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, তখন পূর্বজন্মের আত্মার পক্ষে তার মধ্যে বিরাজ করা মোটেই সম্ভবপর নয়। এ জন্য এ দুই মহামানবের প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা থাকলেও তাঁদের মতবাদকে মানবজীবনের এক আদর্শরূপে গ্রহণ করা যায় না। মানবজীবনের প্রতিনিধিস্বরূপ উভয়েই অমরত্ব কামনা করেছেন এবং অমরত্বলাভের পথও নির্দেশ করেছেন, তবে তাঁদের দার্শনিক তত্ত্বকে সান্ত্বনারূপে গ্রহণ করা যায়, একটা নিশ্চিত অভিজ্ঞতালব্ধ অবস্থারূপে গ্রহণ করা যায় না।

তবে তাঁদের এ নির্দেশ থেকে এ সত্যটি বিশেষভাবে প্রমাণিত হয় যে, সুদূর অতীত থেকে মানবমানসে অমরত্বলাভের জন্য ব্যাকুল বাসনা রয়েছে, এবং সেই বাসনাকে মানুষ যুগে যুগে নানাভাবে প্রকাশ করছে। অমরত্বকে প্রমাণ করার জন্য নানাবিধ যুক্তি পেশ করলেও, সেগুলোর দ্বারা অমরত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রমাণিত হয়নি। তাতে শুধু অমরত্বলাভের জন্য মানবজীবনে যে একটা সহজাত আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, সে-সত্যটি প্রকাশিত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যাঁরা অমরত্ব প্রমাণ করতে অগ্রসর হয়েছেন, তাঁরা সজ্ঞানে অথবা অজ্ঞাতসারে এফ. এইচ. ব্রাডলির সেই সূত্র (Formula) অনুসরণ করেছেন। ব্রাডলির ধারণা ছিল "যে বিষয়ের সম্ভাবনা রয়েছে, তার অস্তিত্বও রয়েছে এবং সে নিশ্চয়ই সত্য"। [What may be is and must be]। যুগে যুগে নানাদেশের মনীষী অমরত্বকে সম্ভাবনা হিসাবে গ্রহণ করে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হয়েছেন এবং তাকে আবশ্যকীয় সত্য বলে গ্রহণ করেছেন।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ও বিশেষ অনুপ্রেরণার বিষয় এই যে, এ জগতের দুজন মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও স্পিনোজা, এ বিশ্বের মধ্যে মানবজীবনের অমরত্বের সন্ধান পেয়েছেন। এ অমরত্ব সম্বন্ধে সমগ্র আদি ও মধ্যযুগের দার্শনিকেরা দীর্ঘকাল যাবৎ সন্ধানে রত ছিলেন। কিন্তু এ দু'জন মনীষী, তাঁদের মতো এ বিশ্বের বহির্ভূত কোন সত্তার মধ্যে অমরত্বের সন্ধানে ব্যাপৃত হননি। তাঁরা পাহাড়-পর্বত অথবা লোকালয় বর্জিত অন্য কোন স্থানের মধ্যে সেই অমরত্বের সন্ধান করেননি। এ মাটির পৃথিবীতেই তাঁরা সে অমরত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, এবং সে অমরত্বলাভে মানুষ যে আনন্দময় জীবনযাপন করতে পারে, তার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কারণ আমরা সাধারণ মানুষ মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত কাতর, আমাদের আশঙ্কা রয়েছে, মৃত্যুর সংগে সংগে আমরা বিস্মৃতির সেই অতল অন্ধকারে তলিয়ে যাব। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায় যে, স্পিনোজা ও রবীন্দ্রনাথের বাণী থেকে আমরা যদি অমরত্ব লাভ করতে পারি, তাহলে মৃত্যু আমাদের কাছে একটা তুচ্ছ পরিবর্তন ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। আমরা অমরত্বের সেই আনন্দঘন রসাস্বাদন করে আনন্দে বিচরণ করতে পারি।

তথ্যনির্দেশ

১. Henry Wordsworth Longfellow, *A Psalm of Life*, (London : J.M. Dent and sons Ltd., New York : E. P. Ductton and Co. INC. reprinted (1947), P. 5

২. 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড (বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ২৮

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতাঞ্জলি (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৮), সং. ২৬, পৃ. ১৭
৪. 'প্রাণ', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রায়ন, প্রথম খণ্ড (বাক্ সাহিত্য, কলিকাতা, ২৫ বৈশাখ, ১৩৬৮), পৃ. ১
৫. 'বলাকা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড (বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ৩৩
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরোগ্য (বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৬২), পৃ. ৯
৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উৎসর্গ (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭০), পৃ. ৩৮
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নৈবেদ্য (বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৬৮), পৃ. ৬৭
৯. Santosh Chandra Sen Gupta, *Rahindranath Tagore* : Homage *From Visva-Bharati*, (Visva-Bharati Santiniketan, 1962), P. 115
১০. আবু সয়ীদ আইয়ুব, পান্থ জনের সখা (দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ. ৪২

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. D. M. Datta, *The Chief Currents of Contemporary Philosophy*, The University of Calcutta, 1961
২. Paul Edwards, *The Encyclopedia of philosophy*, Vols. 1-8, The Macmillan Company and the free press, New york, London, 1967
৩. F. Thilly, *A History of Philosophy*, Central Book Depot, Allahabad, 1973
৪. F. N. Magill, *Masterpieces of World Philosophy*, George Allen and Unwin LTD, London, 1968.
৫. Santosh Chandra Sen Gupta, *Rabindranath Togore*, Visva-Bharati, 1962
৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭২
৭. শ্রীতারকচন্দ্র রায়, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (১৩৬২) ও দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৬২), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়